

ঘাসের গালিচায় হারানো ছায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

বটতলার মাঠে সেই পুরনো কালভার্টটা এখনো আগের মতই আছে। আমি নিহাদ প্রায় প্রতিদিন ঠিক বিকেলে একই সময় এই বটতলার মাঠে এসে উপস্থিত হই। যদিও, খেলাধুলো আমার খুব একটা প্রিয় না। তবুও ঠিক একই সময়ে এই মাঠে এসে উপস্থিত হওয়াটা আমার রুটিনে পরিণত হয়েছে প্রতিদিনের জীবন তালিকায়। আমি বোধহয় এই মাঠের ধুলোয় হারিয়ে যাওয়া কোন স্মৃতি খুঁজি। মাঠের এক কোণে বিশাল বটগাছটার ছায়ায় বসে যখন আমি ডাইরিতে লেখালেখি করতে ব্যস্ত। ঠিক তখনই চেনা একজোড়া পায়ের শব্দ এসে থামল আমার কাছে। আমি কোন দিকে মনোযোগ না দিয়ে আমি আমার কাজ অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু অভ্যাস যেমন মানুষ কোনদিনই ত্যাগ করতে পারে না। ঠিক তেমনি আমার জীবনের একটা অভ্যাস আমি কোনদিনই ত্যাগ করতে পারিনি। অভ্যাসটা তেমন কিছু না আমি আমার সঙ্গে সব সময় একটি ডায়েরি বহন করি এবং আমার কাজ হল আমার মনে যা চলে, যেটা অনুভব করি, যেটা লিখতে ইচ্ছা করে সবটাই আমি ডায়েরিবদ্ধ করে করে রাখি।

আমি আমার মত অবিরাম লিখেই চলেছি এমতাবস্থায় একটি চেনা পরিচিত সুগন্ধ আমাকে মুহূর্তে পাথর করে দিল।

"এখনো সেই মাঠেই পড়ে আছো? সেই একই জায়গায়?"

কণ্ঠস্বরটা চাবুকের মত কাজ করলো। দশটা বছর পেরিয়ে গেলেও এই সুরের মায়া এখনো কমেনি। পাশে তাকিয়ে দেখি, সেই নীল শাড়ি, ঠিক যেমনটা শেষ বার দেখেছিলাম। বিপাশা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে বিস্ময় এবং অদ্ভুত এক বিস্মাদের ছাপ।

চারিপাশটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু মিউটেড হয়ে গেল।

বিপাশা তার মায়ার চোখে আমার দিকে তাকালো এবং সে একটি

মুচকি হাসি দিয়ে আমার পাশে এসে বসলো। আমি যেন অসাড় হয়ে গেলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিপাশা কোন কিছু না বলে শুধু তার হাতটা আলতো করে আমার হাতের উপর রাখল। আমি অসার অবস্থায় পরিলক্ষিত করলাম যে, বিপাশার হাতটা আমার হাতের উপর স্থির হয়ে রয়েছে। বিকেলের এই পড়ন্ত রোদ্রেও বিপাশার হাতআমায় শীতল অনুভব করাচ্ছে। বিপাশার হাতে শীতলতা আমার বুকের ভেতরের এক উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠের চারিদিকে যে যার মত খেলছে। কিন্তু, আমাদের এই জায়গাটুকুতে যেন সময় থমকে গেছে। এক নীরব স্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ধরেছে।

বিপাশা উদাস গলায় বলল, -----

নিহাদ, মানুষকি খুব সহজেই সবকিছু ভুলে যেতে পারে?
আমি পিপাসার দিকে তাকালাম। নীল শাড়িতে ঠিক আগের মতই এক পরীর মত লাগছে তাকে। আমি বললাম, ভুলে যাওয়াটা তো ঐচ্ছিক নয় বিপাশা।

কিছু জিনিস মানুষের ডিএনএ -তে মিশে যায়। আর যখন প্রসঙ্গ তুমি তখন আমি আমার নিজের নাম ভুলতে সক্ষম। কিন্তু, তোমাকে ভোলা আমার কখনোই সম্ভব না। তবে হ্যাঁ যদি তোমাকে আমার হৃদয় থেকে কেউ বুমতে পারে সেটা হলো আমার মৃত্যু। একথা বলতে বিপাশা বলে উঠলো এমন কথা যেন তোমার মুখ থেকে না শুনি।

তুমি যখন এসেছিলে না, তখন আমি এই মাঠে ছিলাম না। আমি ছিলাম আজ থেকে দশ বছর আগের সেই চৈত্র মাসে, যখন তুমি আমাদের কলেজে প্রথম পা রেখেছিলেন। বিপাশা হালকা হাসলো। ওর হাসির শব্দে এক ধরনের সুর আছে, যা আমি বহু বছর শুনিনি। বিপাশা কে নিয়ে মনে মনে কবিতা লিখতে শুরু করলাম তাকে আজকে অনেকদিন পর দেখে আমার কল্পনার জগতে একটি কবিতা ভেসে উঠলো -----

"স্মৃতির ধুলোয় জমিয়ে রাখা
চেনা সেই ঘ্রাণ,
দশটি বছর পেরিয়ে
আজও আকুল করে প্রাণ।
নীল শাড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি,
সময় গেছে থেমে -
পুরনো সেই মাঠের কোণে
আবার এলে নেমে। "

বিপাশা বলে উঠলো নিহাদ কোন জগতে চলে গেলে, শুনছো
নিহাদ?

উত্তরে বললাম হ্যাঁ শুনছি।

বিপাশা বলল, তোমার সেই প্রথম দিনের কথা মনে আছে? তুমি
কত রোগা ছিলে, চশমাটা নাকের উপর থাকতো না বারবার পড়ে
যেত।

আমি চোখের পাতা বন্ধ করলাম। স্মৃতিগুলো তখন সিনেমার শট
গুলোর মত দ্রুত পাল্টাতে শুরু করল। আমার চোখের সামনে
তখন আর বর্তমানের বিকেল নেই। আমি ফিরে গেলাম দশ বছর
আগের সেই রোদেলা দিনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাঠে সেই পড়ন্ত বিকালে বিপাশার স্পর্শে আমি যখন চোখ বন্ধ
করেছিলাম, তখন বর্তমানে সব কোলাহল স্তান হয়ে গিয়েছিল।
স্মৃতি সেই ধুলো জমা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি আবার
সেই দশ বছর আগের দিনগুলোতে ফিরে গেলাম। কলেজের
করিডরে তখন চৈত্র দুপুরের তপ্ত রোদ। আমি সিঁড়ির কোনায়
দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে মেতে ছিলাম ---- বিষয়বস্তু সেই
চিরচেনা, "ভালোবাসা বলে কিছু নেই, সবটাই সৌন্দর্যের খেলা। "
আমি ছিলাম হৃদয়ের ব্যাপারে প্রচন্ড বাস্তববাদী, অনেকটা

পাথরের মত কঠিন। ঠিক সেই মুহূর্তে করিডোরের ওপাশ থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল বিপাশা। সেই ছিল প্রথম দেখা। যদিও দেখাটা ছিল চোখের, হৃদয় চোখ দিয়ে যদিও তাকে দেখিনি এবং অনুভব করিনি। আমার কাছে এটা আজও অজানা একটা প্রশ্ন। যে, ছেলেটি ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। সে কি করে একটা মেয়েকে এত ফুটিয়ে নিরক্ষর করে। এটা ভেবে নিজেই নিজের প্রতি অবাক হয়ে যাচ্ছি। বিপাশার পরনে ছিল নীল রঙের একটা সুতি শাড়ি, কপালে ছোট্ট কালো টিপ, হাতে ইকোনমিক্স এর কয়েকটা মোটা বই বুকের সাথে চেপে ধরা। সে যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তার হাটার সঙ্গে এক ধরনের অভিজাত্য ছিল।

বাতাসে বিপাশা চুলের হালকা সুবাস আর শাড়ির খসখস শব্দ যেন আমার কানে কোন এক অচেনা সুরের মত বাজলো। বিপাশা এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকালো হয়তো এই উচ্চকণ্ঠ তর্কের কারণেই। সেই এক পলকের চাউনি! চশমার ফ্রেমের আড়ালে থাকা একজোড়া শান্ত, গভীর চোখ। যদিও প্রথম দেখা কিন্তু কোন অনুভূতি না জাগলেও আমায় যেন এক অদৃশ্য মায়া গ্রাস করে নিয়েছিল। আমি নিমেষে ভুলে গেলাম সেই কথা এবং আমি আমার তর্কের ব্যাপারে কথা বলতে থাকলাম।

কলেজ শেষে হোস্টেলে গেলাম। আমার রুমে আমি একা থাকি প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো লেখা হলো আমার একটা অন্যতম কাজ লিখতে শুরু করলাম আজকের ঘটনা গুলো তখনই থমকে ভাবতে শুরু করলাম। আমার তর্কের বিষয় নিয়ে আমি নিজেই নিজেকে বললাম ভালোবাসা শুধুই ভালোলাগা সেটা রূপের সৌন্দর্য কিংবা সেটা শারীরিক হতে পারে। ভালোবাসা সেটা যখন দুই জন দুই জনকেই ছাড়া থাকতে পারিনা। একে অপরের কষ্টে দুইজন কষ্ট পায় একে অপরের আনন্দে আনন্দ পাই। আমার জীবনেও এসেছিল ভালোবাসা। কিন্তু, সেটাকে আমি বলি ভালোলাগা। যদিও ভালোবাসাটা ছিল মেয়েটার তরফ থেকে আমার কোন অনুভূতি ছিল না তার প্রতি।

মেয়েটির বাড়ি থেকে যখন ঠিক সেই সময় সে আমায় বলেছিল, নিহাদ আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি বললাম তোমার না বিয়ে ঠিক হয়েছে তুমি তোমার বাড়ির পছন্দের ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে নাও। মেয়েটি একবারের জন্য কিছু বলল না সে চলে গিয়েছিল। তখন থেকে আমি মনে করি ভালোবাসা বলে কিছু হয় না। সবটাই ভালো লাগা। যদি সে ভালোবাসতো কোনদিন সে আমায় ছেড়ে যেত না। এমনটাও হতে পারে তার প্রতি আমার কোন অনুভূতি ছিল না সেই জন্য চলে গিয়েছিল। যদিও মেয়েটি বিয়ের পরেও আমার খোঁজ নিত শুনেছি বন্ধুদের থেকে। নিজেই নিজেকে বললাম কি ভাবছি যা হয়ে গিয়েছে সেটা তো ঠিক করা সম্ভব নয়। এই বলে কিছু ছোট ছোট ঘটনা ডায়েরিতে লিখে ঘুমোতে চলে গেলাম।

সেই দিনের ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা ডায়েরিতে লিখলেও একটা ঘটনা লিখতেই ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হল বিপাশা। বিপাশার কথা আমার মনেই নেই। কলেজ টাইমে পরের দিন কলেজ গেলাম। ক্লাস না করেই ছুট দিলাম বই নিতে লাইব্রেরী, ঠিক লাইব্রেরী ঢুকবো তখনই একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার হাত থেকে পড়ে যায় বইগুলো আমি বললাম দুঃখিত ক্ষমা করবেন। বলে বইগুলো তুলে দিতেই দেখে এটা তো সেই মেয়েটা। যাকে কালকে দেখেছিলাম। মেয়েটি আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। যদিও এটা ছিল আমার দ্বিতীয় দেখা তবুও এটাই রইল আমার প্রথম দেখা। কারণ লাইব্রেরীর সামনে ধাক্কা লাগার পর থেকে আমার ভেতরটা কেমন যেন উলটপালট হয়ে গিয়েছিল। যিনি হাত সারাদিন বইয়ের পাতায় মুখ খুজে থাকতো, সে হঠাৎ করে জানালার আকাশের রং বদলানো দেখতে শুরু করল। বুঝে উঠতে পারলাম না ঠিক কি হয়েছে আমার "আমি কি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়লাম, নাকি তার মায়ায়।" প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে আমি কলেজের সেই নির্দিষ্ট মোড়ে এসে দাঁড়াইতাম। যেখানে বিপাশার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। মনের কোন কোণে আশা থাকতো, হয়তো সে আবার ওদিক দিয়েই আসবে। কিন্তু কয়েকটা দিন কেটে গেল, তারা দেখা নেই। আমার বন্ধু সজল মাঝে মাঝে

রাগিয়ে বলতো, "কিরে নিহাদ, তুই কি কলেজের ল্যাম্পপোস্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলি নাকি? প্রতিদিন এক জায়গায় ঠাই হয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস! "আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত শূন্যতা আমাকে শেষ করে দিত। সত্যিই কি তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

তারপরের দিন ঠিক আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর অপেক্ষায় ঠিকমত অবস্থায় দেখি কলেজের ফাঁকা জায়গায় বসে বই পড়ছে ঘাসের উপর। আমি কাছে গেলাম বললাম আপনার বই গুলো কেমন আছে। আমার দিকে তাকালো এবং সে বলে উঠলো তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিলে কাল। তোমার স্মৃতিশক্তি তো খুব সুন্দর বইগুলোর খোঁজ নিতে এসেছ আজ থেকে কয়েকদিন আগের ঘটনা মনে রেখেছো। এই বলে বিপাশা নিজেই জায়গা করে দিয়ে বলল এখানে বসো। সেই থেকেই টুকিটাকি কথা কলেজের ক্যান্টিনে একসঙ্গে থাওয়া শুরু হলো। আমাদের সম্পর্কটা যদিও এক অচেনা অজানা পরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরে সেটা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেদিন কলেজের লাইব্রেরীতে দুইজন পড়ছি। ক্ষমতা অবস্থায় বিপাশা আমায় জিজ্ঞাসা করলো "হঠাৎ যদি আমি হারিয়ে যাই তুমি আমাকে খুঁজে বের করবে। " সেই দিন আমি কোন উত্তর না দিয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতেই পারি না আমার সঙ্গে কি হচ্ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপাশার সেই প্রশ্নটা—"হঠাৎ হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করবে কি না"—আমার মাথায় অনেকদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু সেই বয়সে আমরা জীবনের জটিল অঙ্কগুলো বুঝতে চাইতাম না;

আমাদের কাছে জীবন মানেই ছিল কলেজের শেষ বেঞ্চ, ভাগ করে থাওয়া এক কাপ চা আর অকারণে হাসাহাসি। দ্বিতীয় বর্ষের সেই বন্ধুত্বের দিনগুলো পেরিয়ে আমরা যখন তৃতীয় বর্ষে পা দিলাম, তখন আমাদের রসায়নটা আর পাঁচটা সাধারণ বন্ধুর মতো ছিল না। ক্লাসের নোট বিনিময় এখন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রধান হয়ে উঠেছে একে অপরের চোখের ভাষা পড়া। আমি এখন আর শুধু ওর কথার শ্রোতা নই, আমি এখন ওর নিরবতারও অংশীদার। বিপাশা এখন আর আগের মতো অনর্গল কথা বলে না, মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চাহনিতে কী থাকে আমি জানি না, তবে আমার বুকের ভেতর এক অদ্ভুত তোলপাড় শুরু হয়।

একদিন বিকেলে কলেজের লাইব্রেরি যখন প্রায় জনশূন্য, আমরা দুজন একদম পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসেছিলাম। জানালার বাইরে আকাশটা তখন মেঘলা, গুমোট একটা ভাব। বিপাশা ওর ইকোনমিক্স বইয়ের ওপর মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিল। আমি ওর পাশে বসে নীরবে রবীন্দ্র-রচনাবলী উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ ও মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো। ওর চোখে তখন এক ধরণের অসহায়ত্ব। ও খুব নিচু স্বরে বলল, "নিহাদ, বাড়ি থেকে বিয়ের কথা বলছে। বাবা চায় আমি পড়াশোনা শেষ করেই ওনার বন্ধুর ছেলের সাথে আমেরিকায় চলে যাই।" কথাটা শোনার পর মনে হলো আমার পায়ের তলার মাটিটা হঠাৎ সরে গেল। লাইব্রেরির সেই হাজার হাজার বইয়ের সুপ যেন আমার ওপর ভেঙে পড়ছে। আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমার হাত কাঁপছিল। বিপাশা আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। ওর হাতের সেই শীতল স্পর্শ আজও আমি অনুভব করতে পারি। সে ফিসফিস করে বলল, "তুমি কি চুপ করেই থাকবে? কিছু তো বলো!"

আমি সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম, বিপাশা আমার কাছে কেবল একজন বন্ধু নয়। ও আমার অস্তিত্বের এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে ও না থাকলে আমি কেবল একটা চলন্ত লাশ ছাড়া

আর কিছুই নই। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম,
"বিপাশা, আমি তো খুব সাধারণ একটা ছেলে। আমার তো
তোমাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, শুধু এক বুক ভালোবাসা
ছাড়া।" বিপাশা সেদিন স্নান হাসল। ও বলল, "ওই ভালোবাসাটাই
তো আমার সবথেকে বড় সম্পদ নিহাদ। কিন্তু সমাজ আর
পরিবার কি শুধু ভালোবাসা বোঝে?" সেইদিন আমরা প্রথম
অনুভব করলাম যে বাস্তব পৃথিবীটা আমাদের এই কলেজের
ক্যাম্পাসের মতো সুন্দর নয়। বাইরে অনেক কঁটাতার, অনেক
নিয়ম-কানুন। আমরা দুজনেই সেদিন অনেকক্ষণ কাঁদলাম।
কোনো শব্দ নেই, শুধু চোখের জল বইয়ের পাতায় পড়ে
কালিগুলোকে লেপে দিচ্ছিল।

সেই সন্ধ্যার পর আমাদের সম্পর্কের রঙ বদলে গেল। আমরা
এখন আর শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি না, আমরা এখন বর্তমানকে
আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত এখন দামী।
একদিন আমরা কলেজের পেছনের সেই নির্জন বটতলায় বসে
ছিলাম। বিপাশা ওর গলার একটা রূপোর চেন খুলে আমার হাতে
দিল। ও বলল, "এটা আমার দাদির দেওয়া। এটা তোমার কাছে
রাখো। যদি কোনোদিন সত্যি হারিয়ে যাই, এই চেনটা তোমাকে
মনে করিয়ে দেবে যে বিপাশা নামের কেউ একজন তোমাকে
পৃথিবীর সবথেকে বেশি ভালোবাসত।" আমি সেই চেনটা হাতের
মুঠোয় চেপে ধরলাম। আমার দুচোখ ফেটে জল আসছিল। আমি
ওকে কথা দিলাম, পরিস্থিতি যাই হোক, আমি লড়ে যাব। কিন্তু
নিয়তি বোধহয় আড়ালে বসে হাসছিল। বিপাশা সেদিন আমার
কাঁধে মাথা রেখে বলেছিল, "নিহাদ, চল আমরা এই মুহূর্তেই
কোথাও পালিয়ে যাই। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, যেখানে
কোনো নিয়ম থাকবে না।" আমি ওর কপালে একটা আলতো চুমু
খেয়েছিলাম। সেই প্রথম স্পর্শে মনে হয়েছিল গোটা পৃথিবীটা স্তব্ধ
হয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানতাম না, এই মধুর মুহূর্তগুলোই
একদিন বিষাদ হয়ে আমার স্বপ্নে ফিরে আসবে। আমাদের সেই
রঙিন দিনগুলোর ওপর তখন থেকেই কালো মেঘ জমতে শুরু

করেছিল, যা আমাদের অজান্তেই আমাদের বিচ্ছেদের পথে ঠেলে দিচ্ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিপাশার দেওয়া সেই রূপোর চেনটা আমি গলার সাথে চেপে শুয়ে থাকতাম। ওটা কেবল একটা গয়না ছিল না, ওটা ছিল আমার টিকে থাকার রসদ। কিন্তু আমরা যতই নিজেদের গোপন রাজ্যে সুখে থাকতে চাইতাম না কেন, চারপাশের দেয়ালগুলো যেন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল। চতুর্থ পর্বের এই সময়টা ছিল আমাদের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষার মতো। কলেজের সেই দিনগুলোতে আমাদের আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। ক্যাম্পাসের করিডোর থেকে শুরু করে ক্যান্টিনের আড্ডা—সবখানে আমাদের নিয়ে কানাঘুষো শুরু হলো। মানুষ বোধহয় অন্যের সুখ সহ্যে পারে না, বিশেষ করে যখন সেই সুখের মাঝে কোনো স্বার্থ থাকে না। একদিন সকালে কলেজে ঢোকার পর দেখলাম সজল খুব বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ও আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, "নিহাদ, সাবধানে থাকিস। তাদের কথা বিপাশার বাড়িতে কেউ একজন জানিয়ে দিয়েছে। ওর বাবা আজ কলেজে আসতে পারেন।"

আমার বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই হিম হয়ে গেল। আমি পাগলের মতো বিপাশাকে খুঁজতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ওকে পেলাম লাইব্রেরির সেই পুরনো কোণটাতে। ও কাঁদছিল। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে আছে। আমাকে দেখেই ও জড়িয়ে ধরল। কোনো সংকোচ নেই, কোনো ভয় নেই—কেবল হারানোর এক তীব্র আতঙ্ক। ও ফিসফিস করে বলল, "নিহাদ, বাবা আমার ফোন

নিয়ে নিয়েছেন। কাল রাতে বাড়িতে খুব অশান্তি হয়েছে। ওনারা আমাকে আর কলেজে আসতে দিতে চান না। আজ শেষবারের মতো পালিয়ে এসেছি শুধু তোমাকে দেখার জন্য।" আমি স্তব্ধ হয়ে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। আমাদের সেই সুন্দর পৃথিবীটা যে এত দ্রুত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে, সেটা ভাবতেও পারিনি। আমি শুধু বললাম, "বিপাশা, তুমি ধৈর্য ধরো। আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলব। ওনাকে বোঝাব যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।" বিপাশা স্নান হাসল, সেই হাসিতে কেবল করুণা ছিল। ও বলল, "ভালোবাসা দিয়ে দুনিয়া চলে না নিহাদ, অন্তত আমার বাবার কাছে তো নয়ই। ওনার কাছে অভিজাত্য আর টাকাটাই সব।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই কলেজের বারান্দায় ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল। বিপাশার বাবা এসেছিলেন। তিনি যখন লাইব্রেরিতে ঢুকলেন, সারা ঘরটা এক নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল। আমি ওনার চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। ওনার চাহনিতে ছিল ঘৃণা আর তাম্বিল্য। তিনি বিপাশার হাতটা শক্ত করে ধরলেন এবং কোনো কথা না বলে ওকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। বিপাশা একবার পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। ওর সেই শেষ চাহনিটা আজও আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। ও যেন বলতে চাইছিল, "নিহাদ, আমাকে বাঁচাও!" কিন্তু আমি তখন এক জীবন্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পায়ের শক্তি ছিল না এগিয়ে যাওয়ার। মধ্যবিত্তের ভীৰুতা আর সামাজিক সম্মানের ভয় আমার হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল। সারা কলেজের সামনে বিপাশাকে অপমানিত হতে দেখেও আমি কিছুই করতে পারিনি।

সেই সন্ধ্যার পর থেকে বিপাশা আর কলেজে আসেনি। ওর ফোন বন্ধ, ওর বান্ধবীরাও কেউ ওর খবর জানে না। আমি ওর বাড়ির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতাম। জানালার পর্দাটা একটু নড়লেই ভাবতাম এই বুঝি ও উঁকি দিল। কিন্তু না, কেউ আসত না। আমি শুধু ডায়েরির পাতায় লিখে যেতাম আমাদের না বলা কথাগুলো। রাতের পর রাত আমি সেই রূপের চেনটা মুঠোয়

চেপে ধরতাম আর ভাবতাম—মানুষ কি সত্যিই এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে? কলেজের সেই কোলাহলপূর্ণ দিনগুলো আমার কাছে এখন শ্মশানের মতো মনে হতে লাগল। প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি বেশ যেন আমাকে বিদ্রূপ করে বলত, "তুমিও পারলে না নিহাদ, তুমিও হার মেনে নিলে।" আমি জানতাম না এই অপেক্ষার শেষ কোথায়। কিন্তু মনের ভেতর এক গভীর বিশ্বাস ছিল, বিপাশা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ও তো আমাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু নিয়তি আমাদের জন্য লিখে রেখেছিল অন্য কোনো বিয়োগান্তক গল্প, যার সূচনা হয়েছিল সেই অভিশপ্ত বিকেলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিপাশাকে হারিয়ে ফেলার পর প্রথম কয়েকটা দিন আমার মনে হয়েছিল আমি বোধহয় কোনো দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙলে অভ্যাসবশত ফোনের স্ক্রিনটা দেখতাম, যদি কোনো একটা মেসেজ আসে। কলেজের করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় মনে হতো এই বুঝি লাইব্রেরির মোড় থেকে ও বইগুলো হাতে নিয়ে দৌড়ে আসবে। কিন্তু রুঢ় বাস্তবতা ছিল এই যে, বিপাশার কোনো চিহ্নই আমার আশেপাশে আর নেই। পঞ্চম পর্বের এই সময়টা ছিল আমার জীবনের সবথেকে দীর্ঘ এবং অন্ধকার সময়। কলেজের ক্লাসগুলোতে আমি উপস্থিত থাকতাম ঠিকই, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত বিপাশার সেই বন্ধ জানালার ওপাশে। বন্ধুরা আমাকে সাহায্য দিতে আসত, সজল অনেকবার চেষ্টা করেছে আমাকে স্বাভাবিক করতে, কিন্তু আমি তখন এক অদৃশ্য দেয়ালে নিজেকে বন্দি করে ফেলেছি। ভালোবাসা যে মানুষকে এতটা নিঃস্ব করে দিতে পারে, তা আমি আগে কখনো কল্পনাও করিনি।

বিপাশার সাথে যোগাযোগের সব রাস্তা যখন বন্ধ, ঠিক তখনই একদিন আমার হোস্টেলের ঠিকানায় একটা নীল রঙের খাম এসে

পৌঁছালো। খামের ওপর হাতের লেখাটা দেখেই আমার বুকটা ধক করে উঠল। সেই চেনা টানটান অক্ষরগুলো—বিপাশার হাতের লেখা। কাঁপাকাঁপা হাতে খামটা খুললাম। ভেতর থেকে বের হয়ে এল একটা নীল রঙের কাগজ, যা চোখের জলে ভিজে জায়গায় জায়গায় ঝাপসা হয়ে গেছে। চিঠিতে ও লিখেছিল, "নিহাদ, আমাকে ওরা বন্দি করে রেখেছে। কাল ভোরেই আমাকে জোর করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমার কাছে পৌঁছাতে, কিন্তু পারিনি। ওরা আমার সব স্বপ্ন কেড়ে নিতে চায়। নিহাদ, তুমি কি সেই কথাটার কথা মনে রেখেছ? আমি যদি হারিয়ে যাই, তুমি কি আমাকে খুঁজে বের করবে? আজ আমি সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছি। হয়তো আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না, তবুও জেনে রেখো—আমার প্রতিটি নিশ্বাসে শুধু তোমার নাম মিশে আছে। যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

চিঠিটা পড়ার পর আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলতে শুরু করল। আমি পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তখন রাত প্রায় এগারোটো। কনকনে শীতের রাত, কিন্তু আমার গায়ে কোনো গরম কাপড় ছিল না। আমি শুধু ছুটছিলাম বিপাশার বাড়ির দিকে। মনে হচ্ছিল আমার পা দুটো যেন মাটিতে পড়ছে না, আমি যেন বাতাসের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি। ওর বাড়ির গেটে গিয়ে পৌঁছালাম, কিন্তু সব অন্ধকার। বাইরে থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি গেটটা ধরে ঝাকুনি দিলাম, চিংকার করে বিপাশার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। রাস্তার কুকুরগুলো আমার চিংকার শুনে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কিছুক্ষণ পর ওপরতলার একটা জানালা দিয়ে একজন দারোয়ান নিচে নেমে আসল। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "ওনারা তো বিকালের ক্লাইটেই চলে গেছেন। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন।"

আমি রাস্তার মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। আকাশটা তখন মেঘলা, কোনো তারা ছিল না। মনে হলো আমার মাথার ওপর থেকে আকাশটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। ওই মুহূর্তে আমি অনুভব

করলাম চূড়ান্ত এক শূন্যতা। যে বিপাশা আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল, সে আজ দিগন্তের ওপারে হারিয়ে গেছে। আমার হাতের মূঠোয় তখনো ওর দেওয়া সেই রূপোর চেনটা। আমি ওটাকে শক্ত করে চেপে ধরলাম, যেন ওটাই আমার শেষ অবলম্বন। সেই রাতে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, ভালোবাসা কেবল পাওয়ার নাম নয়, ভালোবাসা মানে এক সীমাহীন অপেক্ষার নামও। আমি নিজেকে কথা দিলাম, পৃথিবী যে প্রান্তেই হোক, আমি বিপাশাকে খুঁজে বের করবই। আমাদের গল্পটা এভাবে শেষ হতে পারে না। কিন্তু আমি জানতাম না যে এই অপেক্ষা আমাকে এক দীর্ঘ ভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবে, যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবতার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপাশার সেই চিঠিটা পাওয়ার পর সাতটি বছর আমি কীভাবে পার করেছি, তা কেবল আমার একাকী বিছানা আর ডায়েরির পাতাগুলোই জানে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের শরীরের ক্ষত শুকিয়ে যায়, কিন্তু মনের ভেতরে যে গভীর খাদ তৈরি হয়, তা বোধহয় কোনোদিনও ভরে না। আমি নিহাদ, সেই কলেজপড়ুয়া লাজুক ছেলেটি থেকে আজ একজন কর্পোরেট চাকুরেতে পরিণত হয়েছি। গায়ের শার্টের রঙ বদলেছে, চশমার ফ্রেম বদলেছে, বদলেছে গলার স্বর—কিন্তু বদলায়নি কেবল বুকের বাম পাশে লালন করা সেই চিনচিনে ব্যথাটা। সাত বছর আমি কোনো নীল শাড়ি পরা মেয়েকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়েছি, ভিড়ের মাঝে পরিচিত পারফিউমের গন্ধ খুঁজলে পাগল হয়ে ছুটে গেছি। কিন্তু বিপাশা ফেরেনি। মানুষ কি চাইলেই এভাবে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে?

স্মৃতির সেই জগত থেকে আমি যখন বর্তমানের এই মাঠে চোখ মেললাম, দেখলাম গোখূলের মরা আলোটা বিপাশার মুখে এসে

পড়েছে। সাত বছর আগে যে মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছিল, সে আজ রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে আমার একদম পাশে বসে আছে। ষষ্ঠ পর্বের এই মুহূর্তটি যেন আমার কাছে এক দীর্ঘ উপন্যাসের শেষ পাতা, যা আমি বারবার পড়তে চাই। বিপাশা আমার হাতের ওপর ওর সেই শীতল হাতটা রেখে দূরে তাকাচ্ছিল। মাঠের কোণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখনো খেলা করছিল, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটুকুতে যেন এক অদ্ভুত নীরবতা।

বিপাশা খুব নিচু স্বরে বলল, "নিহাদ, আমি ফিরে এসেছি। আমাকে ফেরাতে অনেক দেরি হয়ে গেল, তাই না?" আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর চোখের নিচে এখন ক্লান্তির ছায়া, কিন্তু সেই মায়াকাটা আগের মতোই অমলিন। আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, "দেরি তো হয়েছেই বিপাশা। সাতটা বছর একটা মানুষের জীবনের কত বড় সময়, তুমি কি জানো? আমি প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত তোমার সেই নীল খামের চিঠির কথা ভেবে বেঁচে ছিলাম। তুমি বলেছিলে না—হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করব কি না? আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, অন্য কোনো মানুষের মাঝে, অন্য কোনো শহরে।" বিপাশা একটু স্নান হাসল। ওর হাসিতে আজ আর সেই কলেজের চঞ্চলতা নেই, আছে এক বুক চাপা কষ্ট। ও বলল, "বিদেশের সেই দিনগুলো আমার জন্য জেলখানার মতো ছিল নিহাদ। বাবা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ছাড়তেন না। কিন্তু মনে মনে আমি সবসময় এই মাঠেই বসে থাকতাম, তোমার পাশে।"

আমি অনুভব করলাম আমার চোখের কোণটা ভিজে উঠছে। সাত বছর পর আজ মনে হচ্ছে আমার এই শুষ্ক জীবনে আবার বসন্তের বাতাস দিচ্ছে। আমি পকেট থেকে সেই পুরনো রূপার চেনটা বের করলাম, যা সাত বছরেও আমি হাতছাড়া করিনি। চেনটা যখন ওর সামনে ধরলাম, বিপাশা স্তব্ধ হয়ে গেল। ও ভাবতেও পারেনি যে এই তুচ্ছ জিনিসটা আমি এত যত্ন করে আগলে রেখেছি। ওর চোখ দিয়ে টুপ করে এক ফোঁটা জল ঘাসের ওপর পড়ল। ও ফিসফিস করে বলল, "তুমি এখনো এটা রেখেছ?

আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ঘৃণা করে এই সবকিছু ফেলে দিয়েছ।" আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মূঠোয় নিয়ে বললাম, "ঘৃণা করা কি এতই সহজ বিপাশা? ভালোবাসা যদি সত্যি হয়, তবে ঘৃণা সেখানে জায়গা পায় না।"

মার্ঠের বাতাসটা এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। বিপাশা আমার কাঁধে মাথা রাখল। ঠিক যেমনটা ও কলেজের সেই শেষ দিনগুলোতে রাখত। ওর চুলের সেই অতি পরিচিত সুবাস আমার নাকে এসে ধাক্কা দিল। আমার মনে হলো, সাত বছরের এই দীর্ঘ মরুভূমি পার হয়ে আমি অবশেষে এক শান্ত মরুদ্যানের এসে পৌঁছেছি। আমি মনে মনে ভাবলাম, এবার আর ওকে যেতে দেব না। এবার সব বাধা টপকে আমি ওকে নিজের করে রাখব। কিন্তু মার্ঠের মাঝখানে একটা অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে ঘনিষে আসছিল। আমি যখন ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, তখন মনে হলো ওর শরীরটা যেন কুয়াশার মতো হালকা হয়ে যাচ্ছে। বিপাশা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "নিহাদ, তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করছো আমি ফিরে এসেছি? নাকি তুমি এখনো সেই সাত বছর আগের স্বপ্নেই আটকে আছ?" ওর এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম। বুকের ভেতরটা কেন জানি অকারণে কাঁপতে শুরু করল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিপাশার ওই একটি মাত্র প্রশ্ন—"আমি ফিরে এসেছি নাকি তুমি স্বপ্নে আটকে আছ?"—মুহূর্তেই আমার শরীরের সমস্ত রক্ত হিম করে দিল। আমি ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরালাম না। না, ও তো সত্যি আমার পাশেই বসে আছে। ওর গায়ের সেই নীল শাড়ির খসখস শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি, ওর হাতের সেই পরিচিত শীতলতা আমার স্বকে অনুভূত হচ্ছে। তবুও কেন জানি মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তটা বড় বেশি নিখুঁত, ঠিক যেমনটা আমি

হাজারবার আমার নির্ধুম রাতে কল্পনা করেছি। সপ্তম পর্বের এই গোধূলি বেলায় আমার চারপাশের বাস্তুব পৃথিবীটা যেন ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছিল। আমি বিপাশার হাতটা আরও শক্ত করে ধরলাম, যেন ও কোনো মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে না যায়।

বিপাশা আমার অস্থিরতা দেখে শান্ত স্বরে বলল, "এত ভয় পাচ্ছ কেন নিহাদ? আমি তো এখানেই আছি। দেখো, সাত বছর আগে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম, আজ সেখান থেকেই শুরু করছি। এই মার্চ, এই বিকেল, আর আমরা দুজন—মাঝখানের সময়টা যেন এক নিমিষেই ধুয়ে মুছে গেছে।" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "ভয় পাচ্ছি বিপাশা, কারণ আমি জানি না এটা সত্যি কি না। সাত বছর আমি শুধু শূন্যতার সাথে কথা বলেছি। আজ যখন তুমি সামনে, তখন মনে হচ্ছে আমি বুঝি কোনো এক জাদুমন্ত্রের ভেতর ঢুকে পড়েছি। বলো না, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কেন একবারও খবর দাওনি?"

বিপাশা উদাস চোখে মাঠের শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে রইল। যেখানে ফুটবল খেলা শেষ করে কিশোরের দল বাড়ি ফিরছে। ও বলল, "খবর দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না নিহাদ। বাবা আমাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পর প্রায় গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। আমার চারপাশের জগতটা ছিল যন্ত্রের মতো। কোনো আবেগ ছিল না, কোনো প্রাণ ছিল না। শুধু বাবার জেদ আর আমার একাকীত্ব। কিন্তু প্রতিটা রাতে আমি চোখ বন্ধ করলে এই মার্চটাই দেখতে পেতাম। আমি দেখতাম তুমি একা বসে আছ, তোমার ডায়েরিতে কী যেন লিখছ। আজ যখন ফিরে এলাম, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। আমি জানতাম তুমি এখানেই থাকবে।"

ওর কথাগুলো শুনে আমার মনের ভেতরের জমাট বাঁধা পাথরটা যেন গলে জল হয়ে গেল। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। সেই গভীর মায়াবী চোখ, যাতে আমি দশ বছর আগেও পথ হারাতাম। আমি বললাম, "বিপাশা, আমাদের আর হারাবার কিছু নেই।

এবার আমি তোমাকে নিজের করে নেব। সব বাধা উপেক্ষা করে আমরা নতুন করে শুরু করব।" বিপাশা হাসল, কিন্তু সেই হাসিতে আজ কোনো উজ্জ্বলতা ছিল না, কেবল এক অদ্ভুত মায়া ছিল। ও বলল, "নতুন করে কি শুরু করা যায় নিহাদ? সময় কি কখনো পিছু ফেরে? আমরা কি আবার সেই কলেজের নিহাদ আর বিপাশা হতে পারব?"

আমি জেদের স্বরে বললাম, "কেন পারব না? ভালোবাসা থাকলে সব সম্ভব।" কিন্তু কথাগুলো বলার সময় আমি নিজের কণ্ঠস্বরে একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। মাঠের ওপর তখন কুয়াশা নামছে। চারপাশের মানুষের কোলাহল একদম থেমে গেছে। ঝালমুড়িওয়ালার ঘন্টার শব্দটা বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, যেন ওটা এই জগতের কোনো শব্দ নয়। আমি লক্ষ্য করলাম, বিপাশার পায়ের নিচে ঘাসগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে, ও বসে থাকা সত্ত্বেও ঘাসগুলো একটুও নুয়ে পড়েনি। আমার বুকের ভেতর এক তীব্র যন্ত্রণার উদ্ভব হলো। আমি চিৎকার করে ওকে কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। মনে হলো আমি এক বিশাল সমুদ্রের তলদেশে আটকা পড়েছি, যেখানে জলরাশি আমাকে চারপাশ থেকে চেপে ধরছে।

বিপাশা আমার কপালে ওর শীতল হাতটা রাখল। ও ফিসফিস করে বলল, "নিহাদ, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে না? তুমি তো অনেকক্ষণ হলো এখানে একা বসে আছ।" ওর 'একা' শব্দটা আমার মাথায় হাতুড়ির মতো আঘাত করল। আমি কি একা? আমি কি এতক্ষণ ওর সাথে কথা বলছিলাম না? আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখের সামনে সবকিছু দুলছে। বিপাশার নীল শাড়ির রঙটা যেন আগুনের মতো লাল হয়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম, আমি এক অদ্ভুত মায়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছি, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিপাশার ওই "একা" শব্দটা আমার কানে যেন হাজারটা ঘন্টার মতো একসাথে বাজতে লাগল। আমি ওর হাতটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলাম। না, এটা হতেই পারে না। ওর হাতের হাড়ের গঠন, গায়ের সেই পরিচিত পারফিউম, এমনকি ওর শাড়ির আঁচলের স্পর্শ—সবই তো বাস্তব। তবে কেন চারপাশটা এভাবে ঝাপসা হয়ে আসছে? অষ্টম পর্বের এই গোধূলি বেলায় আমার মনে হলো, আমি এক অদৃশ্য গোলকধাঁড়ায় আটকা পড়েছি। মাঠের সেই ফুটবল খেলা কিশোররা কখন চলে গেছে আমি টের পাইনি। এখন পুরো মাঠটা জনশূন্য, কেবল দূরে একটা নিস্তেজ সোডিয়াম ল্যাম্প মিটমিট করে জ্বলছে।

বিপাশা আমার দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত শান্ত হাসি হাসল। সে বলল, "নিহাদ, তুমি কি জানো? মানুষ যখন খুব বেশি কোনো কিছু চায়, তখন তার মস্তিষ্ক সেই চাওয়াটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তুমি সাত বছর ধরে আমার সাথে কথা বলার জন্য ছটফট করেছে, আজ তাই আমি তোমার সামনে এসেছি। কিন্তু এই আসাটা কি খুব বেশি জরুরি ছিল?" আমি অস্থির হয়ে বললাম, "বিপাশা, এসব কী বলছো? তুমি কি আবার চলে যাওয়ার বাহানা খুঁজছো? আমি তোমাকে আর এক মুহূর্তের জন্য ছাড়ব না।"

বিপাশা এবার উঠে দাঁড়ালো। ও যখন ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল, আমি লক্ষ্য করলাম কোনো শব্দ হচ্ছে না। শুকনো ঘাসগুলো ওর পায়ের নিচে মচমচ করে ভেঙে যাচ্ছে না, বরং ও যেন বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। ও মাঠের মাঝখানের সেই বড় বটগাছটার দিকে ইশারা করে বলল, "মনে আছে নিহাদ? এই গাছটার নিচে বসে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের হাজারো গল্প বলেছিলাম। তুমি বলেছিলে আমরা একটা ছোট ঘর করব,

জানালার পাশে কৃষ্ণচূড়া থাকবে। আজ কেন জানি ওই ঘরটার কথা খুব মনে পড়ছে।"

আমি ওর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলাম। আমার পা দুটো কেমন যেন ভারি হয়ে আসছে, যেন কেউ মাটির তলা থেকে আমাকে টেনে ধরছে। আমি বললাম, "চলো বিপাশা, আজই আমরা সেই ঘরটা খুঁজে বের করি। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর নয়।" বিপাশা বটগাছটার নিচে গিয়ে থামল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে স্থির হয়ে তাকালো। ওর চোখে তখন এক অপার্থিব উজ্জ্বলতা। ও বলল, "নিহাদ, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমাকে ফিরে যেতে হবে। তুমি কি আমার সাথে আসবে?" আমি এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললাম, "হ্যাঁ, আসব। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব।" বিপাশা ওর হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি যখন ওর হাতটা ধরতে গেলাম, দেখলাম আমার হাতটা ওর শরীরের ভেতর দিয়ে গলে যাচ্ছে। ও কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, ও যেন শুধুই আলোর তৈরি একটা প্রতিচ্ছবি। আমার বুক চিরে একটা আত্ননাদ বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু গলার কাছে এসে সেটা দলা পাকিয়ে আটকে গেল। চারপাশের বাতাসটা হঠাৎ খুব ভারী হয়ে এল, কানে এক ধরনের তীব্র ভোঁ-ভোঁ শব্দ শুরু হলো।

বিপাশা ফিসফিস করে বলল, "তুমি বড্ড বেশি ভালোবাসতে নিহাদ, এতটাই যে আমাকে তুমি মরতেও দিলে না। সাত বছর আগে সেই বিমানে ওঠার পর যখন মাঝ আকাশে আগুন লেগেছিল, তখন আমি শুধু তোমার নামটাই ডেকেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে আজ অবধি মুক্তি দাওনি। তোমার এই কল্পনার জগতে আমাকে আটকে রেখেছ।" ওর এই কথাগুলো আমার মাথায় বজ্রপাতের মতো আঘাত করল। বিমান দুর্ঘটনা? আগুন? আমি কি তবে কোনো মৃত মানুষের সাথে কথা বলছি? আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। চোখের সামনে বিপাশার নীল শাড়িটা ধীরে ধীরে ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, "না বিপাশা! যেও না! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না! তুমি বেঁচে আছো, তুমি এখানেই আছো!" কিন্তু আমার চিৎকারটা অন্ধকারের কোনো অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল। চারপাশের মাঠ, সোড়িয়াম ল্যাম্প, বটগাছ—সবকিছু যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমি অনুভব করলাম আমি খুব দ্রুত নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এক গভীর, অন্তহীন অন্ধকার আমাকে গিলে ফেলার জন্য হাঁ করে আছে। আমি শুধু শেষবারের মতো বিপাশার সেই মায়াবী হাসিটা দেখতে পেলাম, যা ধীরে ধীরে কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিপাশার সেই শেষ কথাগুলো—"আমাকে মরতেও দিলে না"—আমার কানের পর্দায় বারবার আছড়ে পড়ছিল। বিমান দুর্ঘটনা? মাঝ আকাশে আগুন? না, এটা হতে পারে না। আমার মস্তিষ্ক এই নির্ভুর সত্যটাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। নবম পর্বের এই অন্ধকার কালবেলা যেন আমাকে এক আদিম যন্ত্রণার মুখে ঠেলে দিল। আমি সেই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাতাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। "বিপাশা! ফিরে এসো! আমি জানি তুমি আছো, তুমি কোথাও যাওনি!" আমার গলার স্বর কান্নায় বুজে আসছিল। কিন্তু চারপাশের নিস্তব্ধতা যেন আমাকে বিদ্রূপ করছিল।

হঠাৎ মনে হলো, মাঠটা আর মাঠ নেই। চারপাশের দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমাদের সেই পুরনো কলেজের করিডোরে। কিন্তু সেই করিডোরে কোনো প্রাণ নেই। দেয়ালগুলো নোনা ধরা, মেঝের ওপর পুরু ধুলোর আস্তরণ। লাইব্রেরির সেই মোড়টা, যেখানে আমাদের প্রথম ধাক্কা লেগেছিল, সেখানে আজ শুধুই মাকড়সার জাল। আমি পাগলের মতো করিডোর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। প্রতিটি ক্লাসরুমের

দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছি আর ডাকছি, "বিপাশা! তুমি কি এখানে?" কিন্তু প্রতিটি রুম থেকে কেবল আমার নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার নিজের স্মৃতির গোলকধাঁড়ায় আটকা পড়ে গেছি। আমার অবচেতন মন আমাকে এই মায়াজাল থেকে বের হতে দিচ্ছে না। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম করিডোরের শেষ প্রান্তে বিপাশা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে সেই নীল শাড়ি, হাতে সেই পুরনো ডায়েরিটা। ও আমার দিকে তাকিয়ে শ্লান হাসল। ওর সেই হাসিটা এবার আর মায়াবী নয়, বরং প্রচণ্ড বিষাদময়। ও বলল, "নিহাদ, তুমি কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ? যা হারিয়ে গেছে, তাকে জোর করে ধরে রাখা যায় না। তুমি আমাকে সাত বছর ধরে তোমার মনের কারাগারে বন্দি করে রেখেছ। এবার আমাকে মুক্তি দাও।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "মুক্তি দেব না! তোমাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। যদি মৃত্যুতেই আমাদের মিলন হয়, তবে আমি মরতে রাজি। শুধু আমার সামনে থেকে যেও না।" আমি ওর দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু আমি যতই কাছে যাই, করিডোরটা ততই লম্বা হয়ে যায়। ও যেন এক মরীচিকা, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু দূর থেকে অনুভব করা যায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চারপাশের দেয়ালগুলো যেন নড়াচড়া শুরু করেছে, তারা আমাকে পিষে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছে।

বুকের ভেতর এক তীর যন্ত্রণা শুরু হলো, যেন কেউ স্বলন্ত কয়লা আমার হৃদপিণ্ডের ওপর রেখে দিয়েছে। আমি হাঁটু গেড়ে ধূলোমাখা মেঝেতে বসে পড়লাম। আমার চোখের সামনে তখন আমাদের সেই সোনালী দিনগুলো সিনেমার মতো বয়ে যাচ্ছে—প্রথম চা খাওয়া, বৃষ্টির দিনে ভিজে একাকার হওয়া, সেই রূপোর চেনটা একে অপরকে দেওয়া। প্রতিটি সুখের স্মৃতি এখন বিষ হয়ে আমার শরীরে মিশে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম, বিপাশাকে ফিরে

পাওয়ার কোনো পথ নেই। ও আজ কেবল আমার কল্পনা, আমার দীর্ঘশ্বাসের এক দীর্ঘ প্রতিধ্বনি।

বিপাশা ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এল। ওর ছায়াটা আমার ওপর পড়ল। ও নিচু হয়ে আমার কপালে ওর বরফশীতল হাতটা রাখল। ও ফিসফিস করে বলল, "নিহাদ, এবার চোখ খোলো। অনেক রাত হয়েছে। জেগে ওঠার সময় হয়েছে তোমার।" ওর কন্ঠস্বরটা দূর থেকে ভেসে আসা কোনো বাঁশির সুরের মতো শোনাল। আমি অনুভব করলাম আমার চারপাশের অন্ধকারটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে। এক অদ্ভুত আলোকচ্ছটা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আমি চিৎকার করে ওকে শেষবারের মতো ডাকতে চাইলাম, কিন্তু গলার ভেতর কেবল একটা অবরুদ্ধ গোঙানি বের হয়ে এল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিপাশার হাতের সেই অতিপ্রাকৃত শীতলতা যেন আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ওর ফিসফিসানি—"জেগে ওঠার সময় হয়েছে"—আমার কানে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আমি অনুভব করলাম আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, যেন আমি পানির অনেক গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি আর ওপরের দিকে আলোর রেখাটা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ওর হাতটা ধরতে, কিন্তু আমার আঙুলগুলো কেবল শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরল। চারপাশের করিডোর, ধুলোমাখা ক্লাসরুম আর সেই পুরনো কলেজের দেয়ালগুলো কাঁচের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ করেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলাম। মনে হলো ওপর থেকে কেউ আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাস্তবের মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই কানে এল সেই পরিচিত শব্দ—'টক'।

শব্দটা আসছিল আমার মাথার ঠিক ওপর থেকে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি ধড়ফড় করে চোখ মেললাম। আমার কপাল ভিজে গেছে ঘামে, বুকটা ড্রামের মতো ধকধক করে বাজছে। আমি বুঝতে পারলাম আমি আমার সেই পুরনো মাঠের ঘাসের ওপর বসে নেই, কিংবা কলেজের করিডোরেও নেই। আমি শুয়ে আছি আমার মেসের সেই ছোট অন্ধকার ঘরটাতে। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে ঘুরছে আর পাশে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা থেকে একটা ফ্লীণ লালচে আলো বেরোচ্ছে।

আমি অস্ফুট স্বরে ডাকলাম, "বিপাশা?"
কিন্তু কোনো উত্তর এল না। ঘরের নীরবতা যেন আমাকে গিলতে চাইল। আমার টেবিলের ওপর রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটা থেকে আবার সেই শব্দ হলো—'টক'। সেকেন্ডের কাঁটাটা নড়ে ওঠার শব্দ। এই সেই শব্দ, যা আমার স্বপ্নের রাজপ্রাসাদটাকে এক পলকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। আমি বালিশের তলা থেকে আমার ফোনটা বের করলাম। স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে আজকের তারিখ। সাত বছর পর সেই একই দিন। সাত বছর আগে ঠিক আজকের এই তারিখেই বিপাশাকে বহনকারী সেই বিমানটি আটলান্টিকের বৃকে হারিয়ে গিয়েছিল।

আমি উঠে বসলাম। জানালার বাইরে ভোরের আলো তখনো ফোটেনি, আকাশটা ধূসর হয়ে আছে। টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে আমার সেই পুরনো ডায়েরিটা, যার পাতাগুলো গত কয়েক ঘন্টায় আমার স্বপ্নে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি ডায়েরিটা হাতে নিলাম। পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে সেই জায়গায় এসে থামলাম, যেখানে বিপাশার শেষ চিঠিটা রাখা ছিল। সেই নীল রঙের খাম, যা আজ সাত বছর ধরে আমার একমাত্র সঙ্গী। খামটা আজ বন্ধ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালাম। আমার চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও নেই, কেবল এক বিশাল শূন্যতা। আমি বুঝতে পারলাম, বিপাশা আজ আসেনি, সে কোনোদিনও

আর আসবে না। গত দশটি বছর ধরে আমি যে স্মৃতিগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো আসলে আমার নিজের তৈরি এক মরীচিকা। আমি বিপাশাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নয়, বরং নিজেকে ভুলে থাকার জন্য এই মায়াজাল বুনেছিলাম।

আমি আমার গলার দিকে হাত দিলাম। সেই রূপোর চেইনটা এখনো আমার গলায় আছে। ওটা আর শীতল নয়, আমার শরীরের উত্তাপে সেটা গরম হয়ে আছে। আমি চেইনটা খুলে ডায়েরির মাঝখানে রাখলাম। আজ আমি প্রথমবার অনুভব করলাম—ভালোবাসা মানে কেবল আঁকড়ে ধরে রাখা নয়, ভালোবাসা মানে কখনো কখনো মুক্তি দেওয়াও। বিপাশা আমার স্বপ্নে এসে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

বাইরে তখন ভোরের আজান শোনা যাচ্ছে। পূর্ব আকাশে আলোর একটা সরু রেখা দেখা যাচ্ছে। আমি জানালার গ্লিটটা শক্ত করে ধরলাম। ডায়েরিটা বন্ধ করে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সাত বছরের এক দীর্ঘ শীতনিদ্রা শেষে আমি আজ প্রথমবার এক নতুন সকাল দেখতে পেলাম। বিপাশা নেই, কিন্তু ওর ফেলে যাওয়া স্মৃতিগুলো এখন আর বিষাদ নয়, বরং আমার বেঁচে থাকার এক শান্ত শক্তি। আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, "ভালো থেকো বিপাশা, ওপারে ভালো থেকো।"

- বিছানা ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঘরটা আগের মতোই অন্ধকার, কিন্তু আমার মনের ভেতরের সেই ভয়ংকর গুমোট ভাবটা আজ আর নেই। আমি জানি, আজ থেকে আমাকে একাই পথ চলতে হবে। তবে সেই পথ চলায় আজ আর কোনো বিভ্রম থাকবে না, থাকবে কেবল এক শান্ত জীবনের আহ্বান।